নীলোৎপলা

সুকমল নাথ

গ্রন্থতীর্থ

GRANTHA TIRTHA CALCUTTA

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

কালকা মেলে শুভ্রজিতের সিট-বার্থ রিজার্ভেশান করাই ছিল। অতএব টিকিটের ঝঞ্ঝাট আপাতত তার নেই। শুধু ভি. আই. পি স্যুটকেশে কয়েক সেট জামা-প্যান্ট, দাড়ি কাটার সেট, গামছা-লুঙ্গি, পেস্ট ইত্যাদি গোছানো হয় নি। ধার-দেনা করে হাজার তিনেক টাকা যোগাড় হয়ে গেছে। মার নির্লিপ্ত চোখে-মুখে ছেলের সুদিনের দেখা পেলেও একটা বেদনার ছাপ স্পষ্ট। শুভ্রজিত বহু লড়াই সংগ্রাম করে আজ দাঁড়িয়েছে। বাবা একটা সওদাগরি অফিসের কেরানি ছিলেন—হঠাৎ একদিন বাড়ি ফিরলেন না তিনি। বহু খোঁজ করেও আর সন্ধান মেলেনি। সেও প্রায় বারো বছর হয়ে গেল। আইন অনুযায়ী তাঁর বৈধব্য বেশ ধারণ করার কথা। তিনি কিন্তু নির্বিকার। তাঁর ধারণা শুভ্রজিতের বাবা এখনো বেঁচে আছেন। হয়তো বা কোনো ধর্মীয় স্থানে সাধু হয়ে আছেন। এরকম আঁচ তার অভাবের সংসারে বার কয়েক দিয়েছেন শুভ্রজিতের বাবা লোকেশ্বর ভট্টাচার্য। অথচ তিনজনের সংসারে আর্থিক দুরবস্থা থাকার কথা নয়। বাড়তি আয়ও তাঁর ভালো ছিল মাইনে ছাড়াও। অথচ কেন যে এত অভাব সংসারে শত চেষ্টাতেও শুভ্রজিত বোঝে নি। তার সহজ সরল দুর্গাসমা মাও আঁচ করতে পারেন নি অভাবের কারণে। লোকেশ্বর ভট্টাচার্যর ঠাট-বাট কিন্তু কম ছিল না। ফুলবাবু সেজে বেরতেন প্রতিদিন অফিসে। স্যাটেলাইট কোম্পানির মালিক, ম্যানেজার খুব ভালো চোখে দেখতেন লোকেশ্বর ভট্টাচার্যকে। তাঁর মতো একজন লোক কোম্পানিতে ছিল বলেই নাকি কোম্পানির অনেক উন্নতি হয়েছে। ফলে মালিক, ম্যানেজার ভীষণভাবে তাঁর উপর নির্ভরশীল এবং হঠাৎ-ই একদিন তাঁকে সেলস্ ম্যানেজার করে দিল্লি পাঠান। দিল্লি অফিসের তিনিই হর্তা-কর্তা। শুভ্রজিত তখন বছর দশেকের ফুটফুটে ছেলে। দিল্লির কোম্পানির দেওয়া সুদৃশ্য বাংলোয় বড়ো হচ্ছে সে। বছর বারো বয়সে মা শুভ্রজিতকে নিয়ে সোজা চলে আসেন এন্টালির বাড়িতে। তারপরই নিখোঁজ সংবাদ আসে এন্টালিতে। শোকের ছায়া নামে এন্টালির বাড়িতে। অপ্রত্যাশিত এই আঘাতের ধাক্কায় বেসামাল হন নি শুভ্রজিতের মা। একটি গেঞ্জি তৈরির কারখানায় কাজ করে ছেলেকে পড়িয়েছেন। আজ সেই ছেলে দিল্লির মেট্রো এজেন্সির এরিয়া ম্যানেজারের চাকরি পেয়েছে। আনন্দের সংসারে মার চোখে তাই জল। শুভ্রজিতের মনটাও ভারি হয়ে আছে। দীর্ঘ দশ বছর পর ভাগ্যের খেলায় সেই দিল্লিতেই যেতে হচ্ছে চাকরি করতে। শুভ্রজিত তার বাপেরই ধাঁচ পেয়েছে—যেন লোকেশ্বর ভট্টাচার্যের জেরক্স। সেই হাসি, সেই অবয়ব, চলা-ফেরা। মায় উচ্চতা। বিশালদেহী লোকেশ্বর ভট্টাচার্য সৌম্য দর্শন। কীভাবে যে হঠাৎ-ই হারিয়ে গেলেন কে জানে! মার মনটা সেই জন্যই উতলা। সেই অভিশপ্ত দিল্লিতেই ভাগ্যের পরিহাসে তার একমাত্র সম্বল পুত্রকে যেতে হচ্ছে চাকরির জন্য। আজ তিনি একেবারেই একা।

সমস্ত ভাবনা চিন্তা একটা দীর্ঘশ্বাসে নিঙড়ে ফেলে কমলাদেবী ছেলের ঘরে আসেন। শুভ তোর গোছানো হল? দেখি দে, তোর ভি. আই. পি. স্যুটকেশ— আমি সব গুছিয়ে দিই। কমলাদেবী ছেলের স্যুটকেশ গোছাতে লেগে পড়েন। শুভ্রজিত মায়ের মনের অবস্থা আঁচ করার চেষ্টা করে। খুব শক্তমনের মহিলা এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই শুভ্রজিতের। সে

বলে—মা বহুদিন পর দিল্লি যাচ্ছি সময় সুযোগ পেলে বাবার খোঁজও করব তীর্থস্থানগুলোয়। তোমাকে কিন্তু নিয়ে যাব খুব শিগগিরই। কমলাদেবী মুখে হাসি ফুটিয়ে বলেন—এ তোর কলকাতা নয় শুভ। দিল্লি। নিজে আগে থিতু হ, যাব। কমলাদেবী ছেলের স্যুটকেশ সাজিয়ে দেন খুব যত্ন করে। স্যুটকেশের পকেটে লোকেশ্বর ভট্টাচার্যের একটি ছবিও তার নজর এড়ায় না। বেঁচে থাকলে এখন তাঁর বয়স বাহান্ন। লোকটা কোথায় কীভাবে আছে কে জানে। আছেন তিনি এ বিষয়ে কমলাদেবী এখনো একশোভাগ বিশ্বাসী। প্রতিবেশিরা তাঁর এয়োতির চিহ্ন দেখে আড়ালে আবডালে টিপ্পনী কাটলেও তিনি গায়ে লাগান না। সীথের সিঁদুর, হাতের নোয়া, শাঁখা-পলা জ্বল জ্বল করে তাঁর।

শুভ্রজিত চিন্তায় চিন্তায় ঘুমোতে পারে নি কয়েকদিন। মা একা একা কী করে কাটাবে এই বাড়িতে! একটা বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে এসেছে কোথা থেকে মায়ের সঙ্গে থাকবে, কাজ করবে। থিতু হলে দিল্লিতে নিয়ে যাবে তাকেও। মেয়েটা ঝিয়ের মত নয়। নামটাও ভারি মিষ্টি — তিত্‌লি। একটু চঞ্চল এই যা। তবে এই বয়সটা তো চঞ্চলতার প্রতীক।

মা কমলাদেবী দীর্ঘ বারো বছর বুক ভরা শূন্যতা নিয়ে কেমন যেন মনমরা। শুভ্রর এই মুহূর্তে মাকে দুর্গা প্রতিমার সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছে করছে। বাবা নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে আত্মীয় স্বজনদের কিছু হাতানোর চেষ্টায় কিছুদিন খুব ঘন ঘন আসত। মায়ের দৃষ্টি ছল-চাতুরিতে ভরা এইসব আত্মীয়-স্বজনরা সব সময়ই ঘৃণার পাত্র হয়ে দেখেছে। যখন আত্মীয়রা দেখল এখানে কিছুই সুবিধে হবে না সেদিন থেকে আর আসে না। বহু কষ্টে মা তার একমাত্র সম্বল পুত্রের মঙ্গল কামনায় দিন-রাত তপস্যা করেছেন। কড়া দৃষ্টিতে নজর রেখেছেন পারিপার্শ্বিক সব কিছুর উপর। শুভ্র তার মাকে কোনো দিন কটু কথা বলবে না— কোনো দিন বুঝতে বা পেতে দেবে না কোনো কষ্ট। বাবার পোট্রেটটার সামনে দাঁড়িয়ে একমনে চোখ মুদে প্রতিজ্ঞা করেছে বহুদিন। আজ সেই শুভ্র বাইশ বছরের তেজস্বী যুবক। আজ সে নামী কোম্পানির এরিয়া ম্যানেজার।

কমলাদেবী স্যুটকেশ গুছিয়ে ছেলেকে খেতে ডাকলেন। কালকা মেলের সময় আসন্ন। শুভ্র আর কাল বিলম্ব না করে খেয়ে তৈরি হয়ে নিল। মাকে প্রণাম করে বাবার ফটোর সামনে একমনে দাঁড়িয়ে থেকে প্রণাম করে স্যুটকেশ হাতে বাইরে বেরনোর সময় কোনো রকমে কান্না চেপে বলল— মা আমি গিয়েই আগে তোমাকে পৌঁছানো সংবাদ দেব। পরদিন কেমন ব্যবস্থা করেছে কোম্পানি তার সদ্য নিয়োজিত এরিয়া ম্যানেজারের— কেমন বাংলো পাচ্ছি সব জানিয়ে তোমাকে জানালে তুমি তিত্‌লিকে নিয়ে সোজা চলে আসবে দিল্লি। আমার জন্য একটুও ভাববে না— একদম না। মা চিবুকে হাত দিয়ে চুমু খেলেন। শুভ্র দ্রুতগতিতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি ধরে একেবারে হাওড়া স্টেশন। হাওড়া স্টেশন যাত্রী কুলিতে তখন গুলজার। কুলির হুঁশিয়ারি যাত্রীদের চিৎকার হকারদের চায়ে গ্রম সব মিলিয়ে কঠিন অবস্থা। শুভ্র ভিড় এড়িয়ে তার কোচ লক্ষ করে হনহনিয়ে হাঁটছে প্ল্যাটফর্ম ধরে। কোচে রিজার্ভেশন চার্ট টাঙানো শুরু করেছে। যাত্রীদের অহেতুক হুড়োহুড়ি। শুভ্রর বিরক্তি ধরে যায়। কারো ধৈর্য নেই। শুভ্র কোচের সামনে ঠায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। ভিড় কমলে সে ধীরে সুস্থে গাড়িতে ওঠে। তার সিটে একজন বসে আছে। শুভ্র স্মার্টলি বলে— প্লিজ লেট মি সিট্ হিয়ার। দিস্ ইস মাই সিট। ভদ্রলোক উঠে যায়। শুভ্র ধীরে সুস্থে স্যুটকেশ খুলে একটা চাদর বের করে বিছিয়ে

স্যুটকেশটা এক পাশে সরিয়ে রেখে প্যান্ট খুলে পায়জামা পরে নেয়। ওয়েটার এরই মধ্যে এক পেয়ালা কফি দিয়ে যায়। কফির পেয়ালাটা সিপ্ করতেই নজরে পড়ে এক সুন্দরী যুবতীর। বিশাল এক ভি.আই.পি. স্যুটকেশ মাথায় নিয়ে রেল কোম্পানির উর্দি পরা কুলি তার পেছনে। মাঈজি এহি হ্যায় আপকী সিট। শুভ্র লক্ষ করল তারই পাশের সিট। যুবতী কুলির টাকা মিটিয়ে দিতেই কুলি আলতো একটা কুর্নিশের ভঙ্গিমা করে চলে গেল। যুবতী তার সিট ঠিক-ঠাক করে বসে পড়ল। একটা ইংরাজি ম্যাগাজিন খুলে তাতে মনোনিবেশ করল। শুভ্র মনে মনে ভাবল যদি মেয়েটি দিল্লি অবধি যায় তাহলে তার ফাই ফরমাশ না খাটতে হয়। চলার পথে সুন্দরী যুবতী যদি পাশে থাকে তাহলে নানান ঝামেলা। আর পথেই যদি কোথাও নেমে যায় তবে তার পক্ষে মঙ্গলই। সে শুনেছে পথে নারী বিবর্জিতা। তবে সে তো আর তার সহযাত্রিণী নয়! তবে আর এত ভাবনা কীসের! সে নিশ্চিন্ত মনে কফি শেষ করে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। মেয়েটা ভাবছে না তো কীরে বাবা কেমন যুবক— সাত সকালেই শুয়ে পড়ল! কি কালকার পুরো ভাড়া উশুল করার প্রকৌশল! না কি ঘুম কাতুরে। ছেলেটা দেখে তো মনে হয় বাঙালি। তবে বেশ স্মার্ট আর হ্যান্ডসাম! বাঙালিদের মধ্যে এমন চেহারা দুর্লভ। মরুক গে আমার কী! আমি নিজের চরকায় তেল দিই বাবা। এবার মেয়েটি পুরোপুরি পড়ায় মন দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি দুলে উঠল। তার মানে চলতে শুরু করেছে। হুস্-হাস্ করে স্টেশনের পর স্টেশন ছেড়ে গাড়ি ছুটে চলেছে দানবের মতো। শুভ্রর মনে হয়েছিল পাশের মেয়েটি আলাপী হবে— কিন্তু মোটেও না। ম্যাগাজিনের পাতা থেকে সে একবারের জন্যও মুখ তোলে নি। আশ্চর্য্য একি তার সুন্দরত্বের অহমিকা! একা একটি মেয়ে চলেছে রাতের গাড়িতে— পাশের জনের সঙ্গে একবারের জন্যও তার কথা হবে না। কোনো বিপদ হলেও কি এমনিভাবে চলবে? মেয়েটি কি এইভাবে চলতে অভ্যস্ত! আবার এমনও মনে হয়েছে এই সৌন্দর্যের পেছনে কোনো শয়তানী নেই তো? এমন সুন্দরীরা তো অনেক অপকর্মের সঙ্গে জড়িত। এমন কোনো অন্ধকারের সৌন্দর্য নিয়ে চলছে না তো মেয়েটি। দূর কী যে এক ভূত মাথায় চাপল তার। কোথায় আরামে ঘুমিয়ে চলবে না তো যত রাজ্যের আজে বাজে চিন্তা। যেই হোক সে বয়েই গেল শুভ্রর। সে চলেছে তার নতুন সাম্রাজ্যে। যেখানে সে তার মাকে নিয়ে তিত্‌লিকে নিয়ে সংসার বাঁধবে। মা যদি মনে করেন ঘরে বউ আনবে তাহলে তার আপত্তি নেই। তবে এই মুহূর্তে নয়। একটু থিতু হয়ে ধূমধাম করে সে বিয়ে করবে মায়ের পছন্দ মতো। আপাতত এই সুন্দরী যুবতী চুলোয় যাক বলেই সে ঘুমনোর জন্য পাশ ফিরে কাত হয়ে শুল। সবে একটু ঘুমের ভাব এসেছে অমনি যেন সহস্র বীণার তারে ঝঙ্কার হল। শুনছেন, এই যে মিস্টার... শুভ্র পাশ ফিরল। হ্যাঁ আপনাকেই বলছি— আলোটা একটু হাত বাড়িয়ে নিভিয়ে দিন না। ঘুমব এখন। আচ্ছা আদিখ্যেতা তো— উনি ঘুমোবেন বলে অন্যের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাতে হবে! একটু বিরক্তি নিয়ে সে হাত বাড়িয়ে সুইচ অফ করে দিল। মিনিট পাঁচেকও হয়নি এরই মধ্যে আবার সেই মধুর ঝঙ্কার— এবারে রীতিমতো হাত দিয়ে ঠেলে। শুনছেন, এই যে আমি... শুভ্র ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল— কি হল, আপনি কী ভয় পেয়েছেন? খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েটি— ওমা, আমি আবার ভয় পেলুম কখন? ভয় তো মনে হয় আপনিই পেয়েছেন— বাব্বা, যে ভাবে উঠে বসলেন মনে হল ট্রেনটায় ডাকাত পড়েছে। এ্যাঁ ডাকাত! কোথায়? এই কোচে? মেয়েটা আরো জোরে জোরে হেসে উঠল— উঃ, কী সাংঘাতিক লোক আপনি? কে বলেছে ডাকাত? এই তো এক্ষুনি

বললেন ডাকাত পড়েছে। বলে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে এদিক ওদিক তাকায় শুভ্র। বাব্বা, কী সাংঘাতিক ঘুম আপনার। না ডাকাত পড়েনি। মনে হচ্ছিল আপনার ধড়মড়িয়ে ওঠা দেখে। রাতে কখন কোন্ স্টেশন পেরচ্ছে বোঝার উপায় নেই। দেখুন না চা বা কফি পাওয়া যায় কিনা। ওয়েটাররা রাতে চা-কফি কিছুই দেয় না না কি! অথচ সব সময় পাওয়ার কথা। শুভ্র মেয়েটার আদিখ্যেতায় হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারছিল না। ঘড়িতে তখন রাত দুটো। এর মধ্যে চা বা কফির নেশা চাগিয়ে উঠল! শুভ্র অনিচ্ছা সত্যেও ওয়েটারকে দেখল একটি সিটে বসে ঝিমোচ্ছে। সে নেমে তাকে তুলল— ওয়েটার ধড়মড়িয়ে উঠল— জী সাব। শুভ্র বিরক্তি নিয়েই বলল মেম সাবকো কফি পিলাও। ওয়েটার ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থেকে একটা লম্বা হাই তুলে দু'কাপ কফি হাতে করে এনে বলল— লিজিয়ে সাব আপকা কফি। শুভ্র হতবাক— ম্যায়নে নেহি মাঙ্গা, উ মেম সাব কো পিলাও। মেয়েটি হাসল গালে টোল ফেলে— সে কী আমি একা খাব নাকি? আপনিও নিন। দুজনে খাব বলেই তো আপনাকে জাগালাম। নইলে তো আমিই নিতে পারতাম। শুভ্র অবাক, এ আবার কী জ্বালাতন, মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে এক সঙ্গে কফি খাব এ আবার কোন্ আদিখ্যেতা। কথা না বাড়িয়ে অনিচ্ছায় ঢেঁক গেলার মতো সে হাত বাড়িয়ে ওয়েটারের হাত থেকে কফির পেয়ালা নিল। এই অসময়ে কফি মানে প্রকৃতির ডাকও মিলবে অসময়ে। সত্যি সত্যিই তাই হল। দু'চুমুক দিতেই পেটের মধ্যে গুড় গুড় করে উঠল। গরম কফির পেয়ালায় সুরুৎ সুরুৎ করে দ্রুততার সঙ্গে চুমুক দিয়ে শেষ করেই সে ছুটল টয়লেটে। মিনিট দুয়েকের মধ্যে দরজায় টোকা। শুভ্র তাড়াতড়ি সেরে বের হতেই দেখে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। চোখমুখ লজ্জায় রাঙা। দ্রুততার সঙ্গে দরজা ছেড়ে সরে এল সে। আরো দ্রুততার সঙ্গে ভেতরে ঢুকে মেয়েটি দরজা লক করল।

দুজনে এখন মুখোমুখি বসে। দুজনেই ফ্রেস হয়ে বসেছে। চাদর ভাঁজ করে যার যার স্যুটকেশ গুছিয়েও নিয়েছে। যাত্রী সবাই তখনো ঘুমে অচেতন। হঠাৎ প্রচণ্ড দুলুনি খেল ট্রেনটা। ব্যাপার বোঝার আগেই সব অন্ধকার। কতক্ষণ পর শুভ্রর জ্ঞান ফিরেছে কে জানে। প্রথম চোখ মেলেই সে দেখে মেয়েটি তার পাশে তখনো অজ্ঞান। বিশাল স্যুটকেশটা তার উপরে। কপাল কেটে রক্ত ঝরছে। বহু কষ্টে সে উঠে বসল। কোচ দুমড়ে মুচড়ে একাকার। কোচের প্রায় সবাই মৃত। ঘুমের মধ্যেই সব ইহলোক ত্যাগ করেছে। শুভ্রর ঠোঁট চটচটে জিভ দিয়ে দেখল কেটে গেছে। সারা শরীরে ব্যথা। হাড়গোড় গুড়িয়ে গেল কিনা কে জানে। কোনো রকমে ঠেলে উঠে দাঁড়াল সে, মাথাটা একটা চক্কর খেল। চোখ অন্ধকার হয়ে এল— কোনো রকমে টাল সামলে চোখ মুছে দাঁড়াল সে। তারপর তার স্যুটকেশ খুঁজে পেল। মাসখানেকের পুঁজি আছে এতে। ধার দেনা করে যোগাড় করা। জলের বোতলটা নিয়ে মেয়েটার চোখে মুখে ছিটাতেই সে চোখ খুলে তাকাল। প্রথম দেখল শুভ্রকে। দুহাতে আঁকড়ে ধরল তাকে। তুমি কোথায় গিয়েছিলে আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না যেতে পারবে না। কী হয়েছে তোমার? তোমার ঠোঁটে রক্ত কেন? শুভ্র ফ্যাল ফ্যাল করে মেয়েটিকে দেখছে। ও যা করছে তাতে মনে হচ্ছে সে তার জন্ম জন্মান্তরের চেনা। অথচ একসঙ্গে যাত্রী হলেও মাঝ রাতে আলাপ। তাও অস্বাভাবিক। এমন কাছের মতো ছিল না। এখন সে এমন আচরণ করছে যেন সে তার স্বামী। শুভ্র কি করবে বুঝতে পারছিল না। সে ভাবল আচমকা এই দুর্ঘটনায় হয়তো সে মানসিক শকড। একটু পরেই ঠিক হয়ে যাবে। শুভ্রর নজরে এতক্ষণে পড়ল মেয়েটির স্যুটকেশের একটি কোণে নাম লেখা আছে নীলোৎপলা

সেন। তাহলে মেয়েটির নাম নীলোৎপলা। বাঃ! সুন্দর নাম। শুভ্র বলল— এখন কেমন লাগছে উঠে পড়ুন। নীলোৎপলা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকায় তার পানে। একি! তুমি অমন করছো কেন? আমাকে আপনি বলছো কী হল তোমার? শুভ্র এবার নিশ্চিত মেয়েটা শক্‌ড। সে তাকে আপনার জন ভেবেছে। হয়তো দীর্ঘদিন পর স্বামীর কাছে যাচ্ছিল মনে মনে নানা পরিকল্পনা নিয়ে। এ অবস্থায় তাকে আঘাত দেওয়া ঠিক হবে না। যা ভাবছে ভাবুক। এখন সে তাকেই নির্ভর করেছে। মেয়েটি তখনো ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে আছে। শুভ্র বলল— নাও তাড়াতাড়ি ওঠ। আমাদের গাড়ি এ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। ওঠো— উঠতে পারবে তো? বলেই সে তাকে ধরে তুলল। নীলোৎপলা তার বুকে সঁপে দিল নিজেকে। প্রথম নারীর নিবিড় সান্নিধ্যে শিউরে উঠল শুভ্র। এত শান্তি নারীর বুকে!

কোনো রকমে তারা দরজা খুলে বেরিয়ে এল। গাজিয়াবাদের দুতিন কিলোমিটার দূরে এ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে। সবে দুএকজন জেগেছে। ইতিমধ্যে চারিদিকে হই হই। লোকজন ছুটে আসছে। শুভ্রজিত জানে এরা সকলেই যে উদ্ধারে নামবে এমন ভরসা নেই। বেশির ভাগ মানুযই লুঠতরাজ চালাবে। এমনকি মৃতের হাতের, কানের, গলার গয়না পর্যন্ত খুলে নেবে। শুভ্র নীলোৎপলাকে নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়ায়। ইতিমধ্যে রেসকিউ ভ্যান এসে গেছে। রেল কোম্পানি মৃতদেহ সরাতেই ব্যস্ত। আহতদের দিকে নজর কম। মনে হচ্ছে মৃতদেহ গায়েবে এরা সিদ্ধহস্ত। শুভ্রজিত-নীলোৎপলা কিছুদূর হেঁটে একটা রেস্টুরেন্ট পায়। গরম গরম পুরি ছোলার ডাল আর চা খেয়ে এরা বেশ নিশ্চিন্ত হয়। এবার দিল্লি ফেরার ব্যবস্থায় সে তৎপর হয়ে ওঠে। স্থানীয় মানুষজনের সাহায্যে তারা বাস রুটে যায়। দিল্লিগামী একটি বাসে উঠে পড়ে তারা। বেলা নটা নাগাদ দিল্লি পৌছে তারা প্রথমেই যায় তার কোম্পানির দেওয়া বাংলোর ঠিকানা চুনামন্ডিতে। অটোতে দুজনে চেপে যায় চুনামন্ডি। বাংলো দেখে দারুণ খুশি নীলোৎপলা। দুহাত তুলে নাচের ভঙ্গিমায় চক্কর খায় ঘরময়। শুভ্রজিত পড়ে মহা ফ্যাসাদে। একি হল যে মেয়ের সঙ্গে একসঙ্গে বসে কলকাতা মানে হাওড়া থেকে দীর্ঘ পাড়িতে একটা কথা না বলার কষ্ট সেই মেয়ে একটি দুর্ঘটনায় কী করে এমন একান্তই আপনার হয়ে গেল! তবে কী দুর্ঘটনায় তার স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে? নাহলে তাকে স্বামী ঠাওরায় কী করে? শুভ্রজিতএকেবারে নতুন পরিস্থিতিতে এখন কী করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। একি ফ্যাসাদ এসে তার ভাগ্যে জড়াল। কোথায় নতুন চাকরি, মা তিতলিকে নিয়ে নতুন বাংলোয় ঘর সাজানো আর কোথায় হঠাৎই রেডিমেড স্ত্রী নিয়ে সোজা বাংলোয় পদার্পণ! নীলোৎপলা ছুটে এসে শুভ্রজিতকে জড়িয়ে ধরে— তোমার কী হল বলতো? এমন করছো যেন চেনই না আমাকে। হঠাৎ-ই সে শুভ্রজিতকে চুমোয় চুমোয় পাগল করে তোলে। শুভ্রজিত শক্ত কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। নীলোৎপলা শুভ্রজিতকে নীরব দেখে হঠাৎ-ই রাগ করে ছুটে যায় বেডরুমে। উপুড় হয়ে শুয়ে সমানে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলে সে। শুভ্রজিত অনেক কষ্টে শান্ত করে তাকে।

নতুন পরিবেশ, নতুন ঘর আগে গোছাও সব কিচেন দেখ, সব কিছু ঠিক ঠাক আছে কিনা। অবশ্য আজ আমার তাড়া নেই। আমরা হোটেলেই লাঞ্চ-ডিনার সারব আজ। হঠাৎ শুভ্রজিত-এর নজরে পড়ে নীলোৎপলার সিঁথেয় সিঁদুর নেই— হাতে নোয়া শাঁখা নেই। তবে কী অভিনয় করছে? লেডি কিলার নয় তো? কোনো বদ মতলব নেই তো মেয়েটির। নাকি কোনো গ্যাঙ্ লিডার তার পেছনে লাগিয়েছে সবে পাওয়া সুখের সংসারে আগুন লাগাতে!

ঘর পোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়। এমন ঘটনা সে অনেক শুনেছে— নাটক-নভেলে পড়েছে। সে সেরকম কোনো দুষ্ট চক্রে পড়ল না তো? সন্দেহ অবসানে সে নীলোৎপলাকে প্রশ্ন করে বসল— আচ্ছা নীলোৎপলা তোমার সিঁথেয় সিঁদুর হাতে নোয়া শাঁখা দেখছিনা তো? নীলোৎপলা আচমকা প্রশ্নে ছুটে গেল ড্রেসিং টেবিলটার কাছে— সত্যিই সিঁথেয় সিঁদুর নেই, হাত উলটে পালটে দেখল— শাঁখা-নোয়া তো দূরে থাক একগাছা চুড়িও নেই। শুভ্রর দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল তাড়াহুড়োয় আনা হয়নি— তুমি এক্ষুনি নিয়ে এসো। এমা, লোকে দেখলে বলবে কী? যাও দাঁড়িয়ে থেক না নিয়ে এসো— কপট রাগ দেখায় নীলোৎপলা। শেষ পর্যন্ত তাকে ঠেলেই ঘর থেকে বের করে দেয়।

শুভ্র বাইরে গিয়ে কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত এই উটকো মেয়েটা তার সর্বস্ব নিয়ে কেটে পড়বে না তো? তাহলে এই বিদেশ-বিভুঁই জায়গায় খুব মুশকিলে পড়তে হবে। সাত-পাঁচ ভেবে লোকজনকে জিজ্ঞেস করে দোকান খুঁজে সে শাঁখা, সিঁদুর, নোয়া নিয়ে ফিরে আসে। ঘরে ঢুকে অবাক শুভ্র। নীলোৎপলা ভিজে শাড়িতে দাঁড়িয়ে আছে। ভেজা শাড়ির খাঁজে খাঁজে তার যৌবন যেন উপচে পড়ছে। নারীর দেহে এত রূপ লুকিয়ে আছে এই প্রথম দেখল এবং বুঝল শুভ্র। নীলোৎপলা কপট দৃষ্টিতে বলল কী দেখছো হ্যাংলার মতো। কোনোদিন দেখো নি? নীলোৎপলার কথায় শুভ্র যেন মাটিতে মিশে যায়। চোখ দুটি আনত হয় তার। নীলোৎপলা তার শরীর যেন আরো উদোম করে তার পাশে এসে দাঁড়ায়— এই যে হ্যাংলা মশাই, আমার স্যুটকেশের চাবি পাচ্ছি না, এই ভেজা শাড়ি শরীরে জড়িয়ে আর কতক্ষণ থাকব। সারা রাতের ধকলে ক্লান্তিতে আমার অস্থির লাগছিল। বাথরুমে ঢুকে সাওয়ারের নিচে শরীর এলিয়ে দিতেই রাজ্যের সুখ এসে ভর করল। এখন দেখছি শাড়ি বের করার ঝামেলায় পড়ে গেলাম। অনেক খুঁজেও চাবি পেলাম না। দেখ না একটু। শুভ্র তার নিজের চাবিটা বের করল। একই সাইজের ভি.আই.পি. স্যুটকেশ। অন্যের চাবি সে যখন নিজেই জানে না কোথায় সেটা তখন খোঁজা বৃথা। তাই সে নিজের চাবিটা দিয়ে দুএকবার চেষ্টা করে দেখল, আশ্চর্য খুলে গেল! প্রথমেই যা চোখে পড়ল তা হল শালোয়ার কামিজ। তার নিচেই শাড়ি ব্লাউজ ব্রেসিয়ার। একটা কোণায় একশো টাকার একটা বান্ডিল। দশ টাকা, পাঁচ টাকার নোটও পকেটে। সব মিলিয়ে পনেরো হাজার টাকা। শুভ্র অবাক হয় এতগুলো টাকা নিয়ে মেয়েটি একা দিল্লি এল। কোনো ঠিকানা খুঁজে পেল না সে। নাও খুলে দিয়েছি— কোন্‌টা পরবে পর। বলেই শুভ্র পাশের ঘরে চলে গেল। নীলোৎপলা হই হই করে উঠল— এই যে মশাই চললে কোথায়? তুমি পছন্দ করে দাও কি পরব। শুভ্র আঁতকে উঠল— আমি পছন্দ করব মানে! বাঃ, এই না হলে পুরুষ! বুদ্ধির ঢেঁকি একেবারে। শোননি আপ রুচি খানা পর রুচি পরনা! তোমার রুচি মতোই তো আমি পোষাক পরতে চাই মশাই! শুভ্র অগত্যা একটা শালোয়ার কামিজই হাতে তুলে এগিয়ে দিল। কারণ এতগুলো শালোয়ার কামিজ যখন আছে তবে নিশ্চয়ই এই পোষাকই মেয়েটার পছন্দ। নীলোৎপলা দারুণ খুশি হল। সে একটা কালো রঙের ব্রেসিয়ার তুলে দিব্যি বুকের কাপড় সরিয়ে পরতে লাগল। পীনোন্নত বুক মুহূর্তে ঝলকে উঠল শুভ্রর চোখের সামনে। এ দৃশ্য জীবনে সে দেখে নি। মুহূর্তে তার শিরদাঁড়া বেয়ে অভূতপূর্ব একটা শিহরণ খেলে গেল। এক মুহূর্তে তার পরম প্রাপ্তির আনন্দে মন নেচে উঠল। দুর্বল হয়ে গেল সমস্ত স্নায়ু। হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইল সে। নীলোৎপলার ধব্‌ধবে সাদা স্তনযুগল ঘিরে লালের আবর্ত। স্তনবৃন্ত তীক্ষ্ণ—